বিমূর্ততা এবং বাস্তবিকতা

যোগেন চৌধুরী

'অ্যাবস্ট্রাক্ট'— এই কথাটি আমরা নানা অর্থে ব্যবহার করি। এর ব্যাকরণগত অর্থ হল সারাংশ অর্থাৎ কোনো বস্তু বা বিষয়কে ছেঁকে তার সার অর্থাৎ মূল বা মূল্যবান অংশটিকে বার করে আনলে যা পাই তা হল 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'। এর প্রক্রিয়াকে বলি 'অ্যাবস্ট্রাকশন' ও শব্দটির চলতি অর্থও কত রকমের, বিমূর্ত, অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, দুর্বোধ্য, ভাববাদী অবাস্তব ইত্যাদি। আমরা বলি 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া' অর্থাৎ অস্পষ্ট ধারণা, বিমূর্ত ধারণা— বা ভাববাদী ধারণা। সাহিত্য, দর্শনে, বিজ্ঞানে এবং চিত্রকলার ক্ষেত্রে এ কথাটি নানা কারণে বহু ব্যবহৃত। শিল্পীদের কাছে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট' কথাটি অত্যন্ত পরিচিত। চিত্রকলার ইতিহাসে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট' একটি আন্দোলন বিশেষ। এভাবেই আমরা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' কথাটির সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' কথাটির যে সমস্ত চলতি অর্থগুলি জানি, যেমন সারাংশ, কখনও কখনও বিমূর্ত, কিংবা অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য— তা খুবই ন্যায়সংগত কারণে ঘটেছে। কারণ হল কোনো বস্তু বা বিষয়-এর যে বাহ্যিক রূপ বা আকার আমরা দেখি

তাকে যদি বিশ্লেষণ করে, বিভাজন করে সারাংশকে আলাদা করে ছেঁকে বার করি তাহলে অনেক সময়েই সেই বস্তুর রূপ বা আকার এমনকি স্বাভাবিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়।

যেমন জল। জলের অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ— অবস্থা বা সারাংশ হল :

H_2O অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণু ২, অক্সিজেন পরমাণু ১।

দুটোই বায়বীয় পদার্থ। তখন সে তার রূপ ও ধর্ম দুটোই হারিয়ে বসে— তখন তাকে আর জল বলে চেনা যায় না। সে হয়ে ওঠে বিমূর্ত কিংবা অস্পষ্ট এবং অবাস্তব, আমাদের চোখে, লৌকিক অর্থে। কিন্তু ঐ দুই অদেখা বায়বীয় পদার্থ দুটির মধ্যেই তো জলের মূল গুণগুলি লুকিয়ে আছে।

এভাবে যদি একটি ছবি কিংবা ভাস্কর্যকে, তার গড়নকে উদাহরণ হিসেবে নিই তাহলেও এ বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

একটি ছবির বাইরের রূপ হল পাহাড়, গাছপালা, আকাশ, ঘরবাড়ি, মানুষ নদী-নালা কত কী। ছবিতে এই সব উপকরণ— দৃশ্যগ্রাহ্য বিষয়বস্তু থাকে যাকে আমরা চিনতে পারি। চিত্রকলার ইতিহাসে দেখতে পাই, দীর্ঘকাল ধরে অন্যান্য নানা প্রকারের ছবির সঙ্গে এই সব দৃশ্যগ্রাহ্য বস্তুকে নির্ভর করেই অসংখ্য ছবি আঁকা হয়েছে। ক্রমে আধুনিক শিল্পীরা অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানলেন যে ছবি যখন শিল্প হয়ে ওঠে তখন ঐ চেনা রূপগুলি, বিষয়বস্তুগুলি নিমিত্ত মাত্র। এ চেনা রূপ বা বিষয়-বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে বা তার নিচে চাপা থাকে কতগুলি ভাব ও আঙ্গিকগত উপাদান

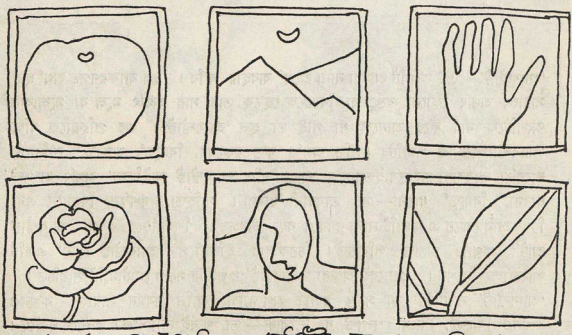

(এলিমেন্টস) যা শেষ পর্যন্ত ছবিটির নান্দনিক সৌন্দর্য গড়ে তোলে। যেমন লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা', কিংবা রেমব্রান্টের 'নাইট ওয়াচ' কিংবা ভ্যান গগের 'সান ফ্লাওয়ার'— এই সব ছবিগুলিই কিন্তু সার্থক ছবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে শুধুমাত্র তার বাস্তব আকৃতির সঠিক রূপায়নের জন্য নয় বরং চিত্রিত আকৃতির সঙ্গে জড়িত থাকা আঙ্গিকগত নান্দনিক উপাদানগুলির যথাযথ প্রকাশের জন্য। ক্রমে আধুনিক শিল্পীরা বাস্তব বিষয় ও রূপকে কোনো একসময় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে

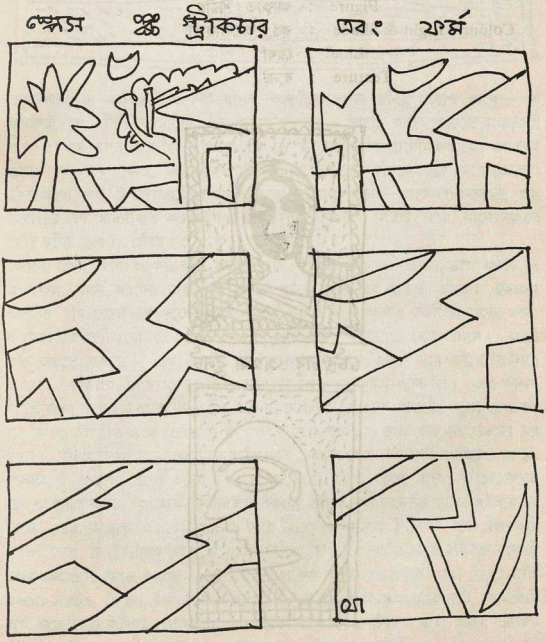

শুধুমাত্র ঐ সব ভাব ও আঙ্গিকগত নান্দনিক উপাদানগুলিকে নিয়েই ছবি আঁকলেন— যা বিমূর্ত এবং অনেক দর্শকের কাছে স্বভাবতই যা দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। জলের গঠন যেমন কতগুলি অমূর্ত বস্তু নিয়ে, এই বিমূর্ত ছবিগুলোর গড়নের পিছনেও রয়েছে কয়েকটি আঙ্গিকগত উপাদান যা অবশ্যই বিশেষ ভাব ও অনুভূতি-সঞ্জাত। সেগুলি হল :—

Space	:	জমি / জমি বিভাজন
Structure / Form	:	কাঠামো / গড়ন
Figure	:	আকৃতি / শরীর
Colour / Light & Shade	:	রঙ / আলোছায়া
Line	:	রেখা
Texture	:	বুনট

টেক্সচার অথবা বুনট

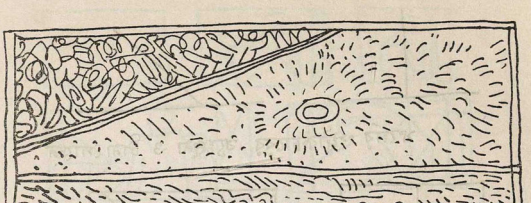

প্রকৃতপক্ষে এ সবকিছুই একটি বাস্তব আকৃতির সফল ছবির মধ্যেও থাকে— সে কারণেই সে ছবিটি আমাদের এত আকর্ষণ করে— কিন্তু বাস্তব আকৃতি বা রূপের সঙ্গে তা এমনভাবে মিলেমিশে থাকে যে সে কারণে তাকে প্রাথমিকভাবে আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু এই সকল উপাদানগুলিই তো ছবিকে 'ছবি' করে তোলে। ছবির মধ্যে এই উপাদানগুলির ছন্দোবদ্ধতা, টানা-পোড়েন— আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং সর্বোপরি এক অলৌকিক ব্যঞ্জনাই তো ছবির নান্দনিক রূপ সৃষ্টি করে, যাকে বলতে পারি ছবির প্রাণ। ছবির হার্ট থবে।

কোনো রেখা কিংবা আকার যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— তখন তার অনুভূতি একরকম, যখন সামান্য হেলে বা বেঁকে থাকে তখন তা আর একরকম। কোনো আকৃতি যদি গোল এবং সুডৌল হয়— তার এক ভাব। আবার করাতের দাঁতের মতো কাটাকাটা হলে কিংবা তে-কোণা হলে তা আর এক অনুভূতি নিয়ে আসে। রঙের কত অদ্ভুত ব্যঞ্জনা। এক একটা রঙ মনের মধ্যে এক একটা ভাব অনুভূতি নিয়ে আসে। কীভাবে নিয়ে আসে তার কিছুটা বুঝলেও অনেকটাই বুঝি না। আর পাশা-পাশি যখন কয়েকটি বা অনেকগুলি মিশ্র বা মৌলিক রঙ একে অপরের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ হয় কিংবা বিপরীত রঙের আকর্ষণে বা বিকর্ষণে আবদ্ধ হয়, তাও কত অদ্ভুতভাবে মন টানে। কিন্তু কেন? তাও ঠিক বুঝি না। অথবা কেন এই লাল গোলাপ ভালো লাগছে? এসবের সঙ্গে মনের কিংবা অনুভবের যোগ আছে বুঝি, কোনো বস্তুর সাদৃশ্য আছে বুঝি, ব্যালেন্স-ইমব্যালেন্স কিংবা সিমেট্রি-অ্যাসিমেট্রির যোগ আছে বুঝি কিন্তু আরো কাছাকাছি একটু গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করলে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না— কেন যে মৌলিকভাবে ঐ গোলাকৃতির মসৃণতা কিংবা রঙের রঙিনতা মনে ঐ রকম অনুভূতি নিয়ে আসে। তার কোনো সঠিক কারণ স্পষ্ট হয় না। শুধু বুঝি ভালো লাগছে কিংবা কেমন যেন লাগছে। তা ঠিক ধরা-ছোঁয়া যায় না। অবশেষে এক অলৌকিক ব্যাপার মনে হয়। একইভাবে যাকে ছবির টেক্সচার বলি অর্থাৎ চিত্রপটে রঙের বুনট— সেসব দেখামাত্র বা স্পর্শমাত্র আমাদের অনুভূতি হয়, ব্রেন সারকিটে

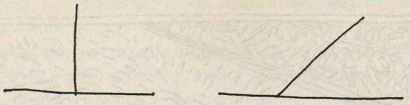

ফর্মের স্ট্রাকচারের ব্যঞ্জনা ও টানা পোড়েন

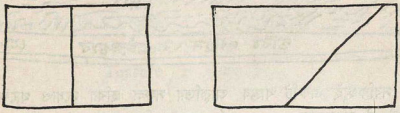

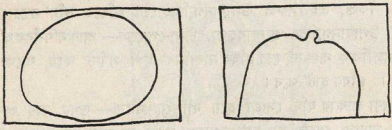

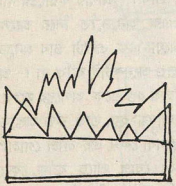

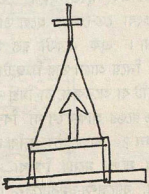

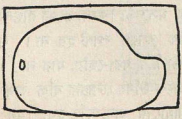

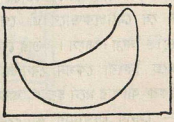

তা গ্রাহ্য হয়, কখনো মসৃণ বা মোলায়েম, কখনো কর্কশ। এই সব অনুভূতি-গ্রাহ্যতা ছবির দৃশ্যগত রূপ অর্থাৎ ভিসুয়াল ইমেজ কিংবা আকৃতির ক্ষেত্রে কত নতুনতর রূপ ও অনুভব সৃষ্টি করে। গানের সুরেও দেখি গলার কাজ, গিটকিরি কিংবা মীড়, ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে যেন সমুদ্রের জলের ওপর। বিতোফেনের সংগীতের কথা মনে পড়ে, কী অস্থির তার উত্তাল ওঠানামা— টানা-পোড়েন। কিংবা যদি অনুভব করি মসলিন কাপড়ের অথবা ভেলভেটের মসৃণতা। ভাস্কর্যেও সেই একই ব্যাপার। বাঙ্কুসীর 'উড়ন্ত পাখী' গায়ে হাত লাগালে কিংবা চাক্ষুষ দেখলে এক নরম অনুভূতি। আবার রামকিংকরের গড়া 'সাঁওতাল পরিবার' যা কাঁকুরে মাটিতে গড়া— তার কর্কশ অনুভূতি। এ সবই তো টেক্সচার বা বুনটের ব্যাপার। গভীর অনুভবের বিষয় সেখানেও। কিন্তু এ সবের মূল কারণ কি আমরা বুঝতে পারছি ? আর একটি উদাহরণ দেব তাতে স্পষ্ট হবে বিষয়বস্তু নয়— প্রকৃতপক্ষে আকার বা গড়নের কী অসাধারণ আকর্ষণীয় ক্ষমতা। নারীশরীরের স্তন কিংবা তার সামগ্রিক

গানের সুরেও দেখি গলার কাছে

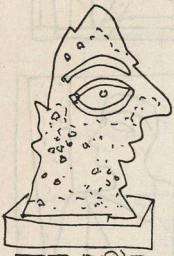

কাঁকুরে মাটিতে গড়া

মসৃন উড়ন্ত পাখীর মত

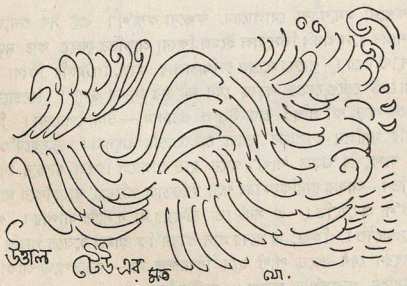

উত্তাল ঢেউ এর মত সো.

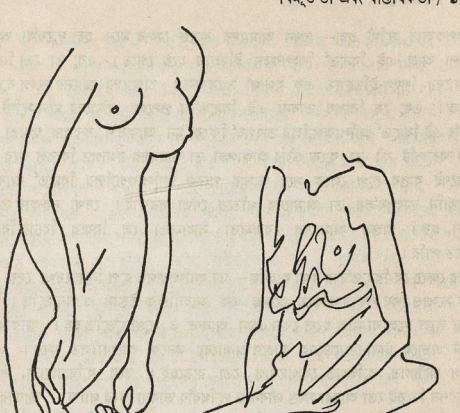

← শরীরের গড়ন যখন সুডৌল

শরীর যখন সুডৌল, তাজা, মসৃণ থাকে যৌবনে— তখন তা মনকে কী আকর্ষণ করে। কিন্তু পরে তার সেই আকৃতি থাকে না— তা ভেঙে পড়ে, যদিও সে নারীই থাকে তবু তা আর মনকে টানে না। কিন্তু কেন? এই বিমূর্ত আকার, রঙ, বুনট, এ-সবের মধ্যে কী এমন রহস্যময়তা রয়েছে— যা আমরা বুঝে উঠতে পারি না অথচ ভাল লাগছে কিংবা লাগছে না। শুধু বুঝতে পারছি এই সব মৌলিক আঙ্গিকগত বিষয় বা উপাদান বা এলিমেন্টসগুলিই চিত্রকলা কিংবা ভাস্কর্য কিংবা সকল নান্দনিক সৃষ্টির মূল বাঁধন এবং মূল আধার। তাই একথা মেনে নিতে পারি যে ছবি ও ভাস্কর্যের বাস্তব রূপের আড়ালে লুকোনো তার আকার, রঙ, রেখা, বুনট ইত্যাদি বিমূর্ত মৌলিক বিষয়গুলির ভূমিকা মূলত অনেক বেশি মূল্যবান এবং অর্থপূর্ণ। যদিও আমরা যখন বাস্তব বিষয়বস্তুগত কোনো ছবি দেখি তখন কখনো মনে হয় না যে এই সব আঙ্গিকগত উপাদানগুলিই প্রকৃতপক্ষে সেই ছবিকে গড়ে তুলেছে— তার সহজগ্রাহ্য বাস্তবতা নান্দনিক ছবির জন্য উপলক্ষ মাত্র। এভাবে ছবির আঙ্গিকগত মৌলিক উপাদানগুলিকে আশ্রয় করে যখন শিল্পচর্চা শুরু হল— অর্থাৎ বিমূর্ত

শিল্পকলার সৃষ্টি হল— তখন আমাদের কাছে সেসব মনে হল দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট। অবশ্য আজ এই বিমূর্ত শিল্পকলা ইতিহাস হয়ে গেছে। তবু তা তো নিশ্চিতই আমাদের শিল্প-ইতিহাসে এক যথার্থ সংযোজন। আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। তবু যে বিশেষ ভাবনা এই বিমূর্ততা প্রসঙ্গে আমাদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে, অর্থাৎ এই বিমূর্ত আঙ্গিকগুলির তাৎপর্য কিংবা মন আকর্ষণ করবার ক্ষমতা অথবা তার স্বরূপটি কী তা বুঝে ওঠার আকাঙ্ক্ষা, তা আমাদের ক্রমাগত বিহ্বল করে। সে কারণেই বাস্তব রূপ থেকে সরে আসার পরেও আঙ্গিকগুলির বিমূর্ত আকার যে কতখানি তাৎপর্যময় তা আমাদের খতিয়ে দেখা দরকার। দেখা দরকার তা কেন এমন হয়। অন্তত আমাদের বোধমতো সাধ্যমতো সে বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি।

ছবির ক্ষেত্রে যে বিমূর্ততার কথা বলেছি— তা আঙ্গিকগত রূপ নিয়ে দেখা দেয় কিন্তু তার সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে রয়েছে এক অলৌকিক উদ্ভাস ও অনুভূতি। অর্থাৎ ফুল লাল হলে বা নীল হলে কেন এমন আনন্দ ও সুখানুভূতি হয়। আকারগুলি কেন এভাবে টানা-পোড়েনের কারণে আমাদের মনকে আন্দোলিত করে। এসবের সঙ্গে শরীরগত, বুদ্ধিগত যোগাযোগ তো রয়েছেই। তবে বুদ্ধিগ্রাহ্যতা, শরীরের অনুরণন দিয়েই তো আমরা সমস্ত জীবন ও পৃথিবীর ভাবনা করে থাকি। আকার, রঙ, রূপ এ সবের পিছনে শুধুমাত্র আঙ্গিকগত অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিমূর্ততা নয়— বরং একটি অখণ্ড বিমূর্ততা যা আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্ভবত সবসময় জড়িয়ে রয়েছে, তা সমস্ত ভাব অনুভূতিরই কেন্দ্রভূমি। শুধুমাত্র চিত্র-শিল্পকলার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সমস্ত পরিসরে, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য— সমস্ত রকম সম্ভাব্য শিল্পকলা থেকে শুরু করে অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বোধের সঙ্গে তা সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। শব্দ, আকার, রঙ, অনুভূতি এ সবকিছু যখন সার্থক হয়ে প্রকাশ পায় তখন তার গুণগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এমন একটা জায়গায় আমরা পৌঁছাই যেখানে আমরা স্পর্শ করি ইটারনিটিকে, অলৌকিক আশ্চর্য এক অনুভব। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি, সৃষ্টিশীলতা যখন সার্থক রূপ নেয় ছবির ক্ষেত্রে, তখন আকার, রঙ, বুনট এবং বিষয়ানুভূতি এ সবকিছু তখন অলৌকিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়, তা অসীমকে স্পর্শ করে— এই সকল আঙ্গিক ও রূপের মধ্য দিয়ে। বরং বলা যায় শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত করেন অসীমকে, অলৌককে। রূপ প্রাণ পায় অরূপের স্পর্শে। তখনই এইসব ছকে বাঁধা হিসেবের আঙ্গিকগুলো নড়ে চড়ে ওঠে। তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তার হৃদয় কেঁপে ওঠে। যেন এক ম্যাজিক। অর্থাৎ সীমা যখন গুণগতভাবে যুক্ত হয় অসীমের সঙ্গে, রূপ যখন অরূপকে ধারণ করে, লৌকিক ভাব যখন হয়ে ওঠে অলৌকিক— তখনই সব সঠিকভাবে প্রকাশ পায়। তখনই ঐ সব আকার, প্রকার, রঙ, রেখা, আলোছায়া— তার হিসেবনিকেশ ছেড়ে দিয়ে প্রাণবন্ত

হয়ে ওঠে এক সর্বাঙ্গীণ বিমূর্ত অলৌকিক অপরূপ নিঃসীম অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের জীয়ন-কাঠির স্পর্শে। তাকে অনুভব করা যায়, মাপা যায় না। দেখা যায় কিন্তু ছোঁওয়া যায় না। তা আকর্ষণ করে কিন্তু তাকে নিজস্ব করে যেন পাওয়া যায় না। তবু বোঝা যায়— কারণ তা গভীরভাবে আমাদের মন টানে। কোনো ছবিতে, গানে কিংবা কবিতায় সেসব যখন সার্থকভাবে প্রকাশ পায় তখন তার টানাপোড়েন আমাদের অস্থির আবেগে আপ্লুত করে। এই বিমূর্ততার স্পর্শ ছাড়া কিছুই মূর্ত হয়ে ওঠে না— যা গুণগতভাবে প্রাণবন্ত। এখানেই অ্যাবস্ট্রাক্টের অথবা বিমূর্ততার সার্থকতা।

আমাদের জীবনের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সঙ্গে, দিন ও রাত্রির আলো-আঁধারের সঙ্গে, চিত্রকলা কিংবা সংগীতের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এর অভাবে শিল্প-সংগীত-কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণহীন, অর্থহীন। কিন্তু কীভাবে তা ঘটে? ভেবে নিতে পারি স্রষ্টা শিল্পী যখন সেই অসীমতাকে অলৌকিকতাকে চেতনার মধ্য দিয়ে স্পর্শ করেন— তখন তাঁর স্পর্শের ছোঁওয়া লাগে তাঁর কাজে, ছবিতে কিংবা কবিতায়। দর্শক কিংবা পাঠক তখন তাঁর অনুভূতিগ্রাহ্যতার কারণে স্রষ্টা শিল্পীর অনুভবের সঙ্গে যুক্ত হন, কখনো একাকার হন। পৌঁছতে পারেন সেই অলৌকিক জগতে কিংবা স্পর্শ করেন সেই রূপ ও অরূপের আলোছায়া, আকার-নিরাকারের সীমাহীনতার সৌন্দর্যকে।

এতো গেল শিল্পীর অনুভবের, চিত্রের, কবিতার, সংগীতের বিমূর্ততার কথা। এবার আসা যাক অন্য কথায়। মূর্ত এবং বিমূর্ততার অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং কংক্রিট— এ বিষয়টিতে। আমরা কংক্রিটকে খুঁজি এবং পেতে চাই। অবাস্তবতা থেকে বাস্তবকে শ্রেয় মনে করি। এখন বাস্তবিক জীবনে এই মূর্ত ও বিমূর্ততার অথবা অ্যাবস্ট্রাক্ট ও কংক্রিটের স্বরূপটি কী এবং তা কতখানি যথার্থ তাই খতিয়ে দেখা যাক। যদিও এ বিষয়টিকে আমরা বুঝতে গিয়ে প্রায় সবসময়ই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে চলে যাই। এই বাস্তব-অবাস্তবতা, আকার-নিরাকার, মূর্ত ও বিমূর্ততা এ বিষয়টি আমরা দৈনন্দিন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যখন ভাবি তখন আমাদের ইচ্ছে হয় তাকে বাস্তবিকভাবে মূর্তভাবে পেতে। স্বভাবতই তাকে কংক্রিটভাবে পেতে চাই। বরং বলা যায়, অধিকাংশ মানুষই মনে করেন এ জীবন ও জগতের সবকিছুই বাস্তবিক কংক্রিট। অর্থাৎ এ জীবনের সঙ্গে যা কিছু যুক্ত বা বাস্তবিক বলে আমরা জানি অর্থাৎ ঘরবাড়ি, চেয়ার-টেবিল, ফুলদানি, নিয়মকানুন, ধর্মনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা— এ সব-কিছুই আমাদের কাছে বাস্তবিক অর্থাৎ কংক্রিট এবং মূর্ত। কারণ, তার ওপর নির্ভর করে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা চলি, চলতে চাই। এই সব জীবনযাপনের উপকরণ বিধিব্যবস্থা এ সবই আমাদের বাস্তব বন্দোবস্ত— এ ছাড়া যেন আর কিছু হতেই পারে না। আমরা এসব নিয়ে নিবিড়ভাবে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ি, খুনোখুনি করতেও ছাড়ি না। অর্থকরী উপার্জনের চেষ্টায় আমাদের মনের সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জন দিই। আমরা যদি গভীরভাবে এর বাস্তব রূপকে বিশ্লেষণ করতে বসি তাহলে ধরা পড়বে

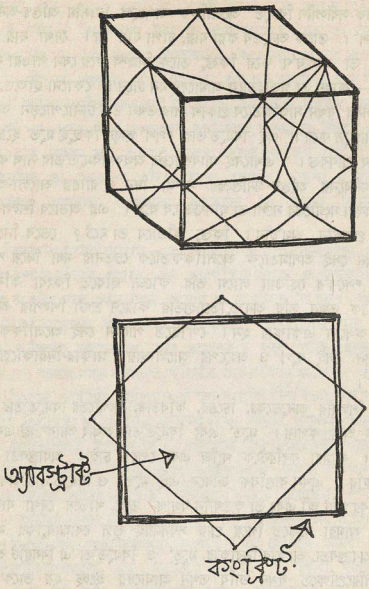

এর প্রকৃত রূপ কী। এখন আমরা খুঁজে দেখব এই সব বস্তু ও বিষয়গুলি সত্যিই কতখানি বাস্তবিক বা concrete বা কতখানি abstract কিংবা বিমূর্ততার সঙ্গে যুক্ত।

যদি জীবনযাপনের কথা ধরি উদাহরণ হিসেবে, এই বাস্তব জীবন এবং অস্তিত্ব-অনাস্তিত্বের বিষয়টি কিংবা এই জন্ম-মৃত্যুর কথা এ সবই অত্যন্ত রহস্যময়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি মৃত্যু, যা অজানা যা বুঝি না, তার বাস্তবিকতা স্বীকার না করি তা হলে ভুল করা হবে। প্রকৃত ভাবনায় জন্ম যতখানি অলৌকিক— এ জীবনযাত্রা যতখানি বিস্ময়কর, মৃত্যুও তাই। কিছুই কংক্রিট নয়, তা আমরা প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি। সবই অনিত্য মনে হয়। প্রাচুর্যের মধ্যেও কোনো সুখশান্তি নেই। হেনরি ফোর্ডের বংশধর আলফ্রেড ব্রুশফোর্ড বলছেন, "I seem to have everything,

but do I have happiness ?" আবার জীবনকে যতখানি নিয়মকানুন দিয়ে বাঁধতে চাই— তা যেন আরও গভীর কোনো নিয়মের কারণে ভেঙে যায়। তার বিমূর্ততা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। যদি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথাও ধরি, আত্মীয়, কাছের লোকজন, বন্ধুত্বের কথা, তা হলে সেখানেও দেখি অদ্ভুত এক টানাপোড়েন। সে টানাপোড়েনও বিমূর্ততায় ভরা, যেন বিমূর্ত এক ছবি রচনা করে যায় সারা জীবন। এ বিশ্বের সঙ্গে তার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, বেঁচে থাকা, প্রতিষ্ঠা-সুখ-শান্তি-সমস্ত কিছু এক গভীরতর অনুভবের বিষয়। সেখানে মূলত 'বাস্তবিকতা' থাকে না, থাকে এক প্রগাঢ় অলৌকিক অনুভূতি ও অস্থিরতার জগত, যাকে আমরা বুঝে উঠতে পারি না, ছুঁতে পারি না, আমাদের ক্রমাগত বিপন্ন করে। জীবনানন্দের কবিতায় সচরাচর সেই অনুভবের কথা দেখতে পাই—

"...অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;..."

কিংবা

"দেয়ালে তাদের ছায়া তবু,
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।
এ সব শূন্যতা ছাড়া কোনোদিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।"

ক' দিন আগে এক সন্ধ্যায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে। কবিতা ও গানের আয়োজন হয়েছিল। আরো অনেকে এসেছিলেন। তার ছ' দিন পর তিনি হঠাৎ 'চলে' গেলেন। তবু তাঁর লেখা পড়ে থাকল অলৌকিক অনুভূতি নিয়ে। সেই জীবন্ত মানুষটির সমস্ত চেতনা ও বোধ তার মধ্যে কী প্রখরভাবে উচ্চারিত হতে থাকে— শুধুমাত্র কথা ও শব্দের—

"...তার সবই চাই,
সে হাত বাড়ায় চারিদিকে
লোলুপ অগ্নির মতো সে হাত বাড়ায় চারিদিকে
হাতে ও জিহ্বায় চাই বাগানের ফুল
গভীর, বিষণ্ণ, কালো— মানুষের ভুল
সমস্ত, সমস্ত, সব।

অথবা

"এখন যাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে, ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো ?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো।"

জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো সম্পর্কেও সেই একই কথা। ঘরবাড়ি, চেয়ার, টেবিল, ফুলদানি এগুলোর বাইরের রূপের মধ্যেও যে সৌন্দর্য তা ছবি বা শিল্পকলার মতোই। রূপ ও গড়নের মধ্যেকার বিমূর্ততার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আবার এই বস্তুগুলোকে ভাঙলে, বিচ্ছিন্ন করলে, বিয়োজন করলেও সেই একই বিমূর্ততার দিকে আমরা পৌঁছব। তখন দেখতে পাই এসব বস্তুগুলো সবই কতগুলি বিশেষ বস্তুর যোগসাজসে নির্মিত এবং আরো গভীরে গেলে দেখব কতগুলি মৌলিক পদার্থ দিয়ে সে সব গড়া। শেষ পর্যন্ত যা খুঁজে পাই তা হল— অণু-পরমাণুর যোগসাজস, যাকে ভাঙতে গেলে আর শেষ খুঁজে পাই না। সব রহস্যময় হয়ে ওঠে। দেখতে পাচ্ছি বাস্তবিকভাবে এখানেও সেই অলৌকিকতা প্রচ্ছন্নভাবে বা বলি, স্পষ্টভাবেই সমস্ত বস্তু ও পদার্থগুলির মধ্যে। এতো বৈজ্ঞানিকভাবেই সত্য। এই বিশ্বজগতে সমস্ত কিছুর মধ্যে চলছে এক অণু-পরমাণুর খেলা। ভাবতে অবাক লাগে— এই যে হাতের কলমটি তার প্রতিটি পদার্থই অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া এবং সেগুলির মধ্যে নিরন্তর নিউট্রন-প্রোটন ও ইলেকট্রন চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বের, এ জগতের প্রতিটি বস্তু— জল, হাওয়া, আলো, গাছপালা, মনুষ্য-শরীর সবকিছুতেই সেই একই ব্যাপার। এক মহাজাগতিক জীবন-স্রোত বয়ে চলেছে যেন। যাকে বুঝতে গেলে সেই অলৌকিক অসীমতার সঙ্গেই এ-সবের যোগ খুঁজতে হয়। শুধু এই সব বস্তু, ঘরবাড়ি এ সবকিছু আমাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে বাস্তবিক বলে মনে হয় এবং সেই আপাত বাস্তবতার কারণে এ সবের অলৌকিক রূপটিকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে। আসলে সারা বিশ্বভুবন জুড়ে সবই পদার্থ-অণু-পরমাণুর খেলা। বীজ, মাটি, জল, আলো, হাওয়া থেকে নির্মাণ পেল গাছ, সেই গাছ বড় হয়ে ফুল-ফলে ভরে গেল— আবার তা মাটিতে মিশে গেল। মৃত্যুর পর মানুষ যেমন বিলীন হয় পঞ্চভূতে। মেঘ থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে নদী,

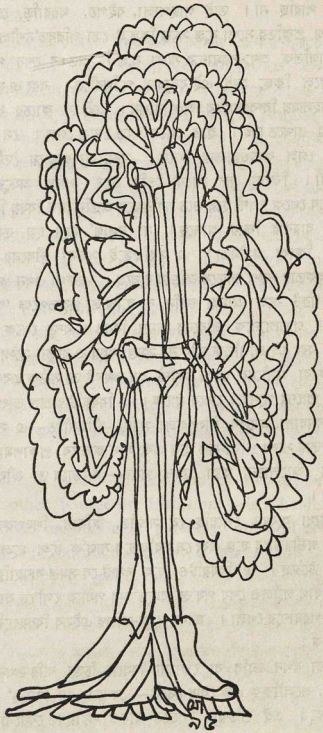

সমুদ্র। আবার সমুদ্র থেকে মেঘ। এ সব তো আমরা দেখছি। সমস্ত বস্তুগুলি প্রতিনিয়ত বারবার তার অন্তর্নিহিত অলৌকিক রূপের আধারে ঘুরে ফিরে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই বস্তুকে, তার বাইরের রূপকে, আমরা খুব পরিচিতভাবে চিনলে, জানলেও শেষ পর্যন্ত সে সবকিছুকে কখনোই আর বস্তুগতভাবেও বাস্তবিক বা কংক্রিট বলে ধরতে পারছি না। তাই গাছপালা, বইপত্র, ঘরবাড়ি, চেয়ার-টেবিল—জীবন-যাপনের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুই তো পরিবর্তনশীল এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-ভাবে মহাজাগতিক অণু-পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত। অতএব শেষ পর্যন্ত কংক্রিট অর্থাৎ 'বাস্তবিক' বলে কিছু নেই এই বস্তুগত পৃথিবীতে। বরং এ সবকিছুই তো অসীম অলৌকিক রহস্যময় বিশ্বজগতের অংশবিশেষ। এই যে কাচের ফুলদানিটি। তাকে কত যত্ন করে রাখতে চাই। হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। সে ভাঙা কাচের টুকরো গুলো চলে গেল কাচওয়ালার কাছে। সেগুলো গলিয়ে তৈরি হল জানলার কাচ কিংবা চিমনী। কিংবা জল থেকে তৈরি হতে পারে অফুরন্ত শক্তি। এভাবে বিমূর্ততাই সব থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সবকিছুর অন্তর্নিহিত বিষয় হিসেবে।

একটা কথা বারবার ফিরে আসছে। যা যথার্থ মনে হয় তা হল বিমূর্ততা এবং অলৌকিকতা কিংবা অসীমতা। এ সবকিছুই সর্বদা জীবনের ও জাগতিক সমস্ত রকমের বাস্তবিকতার সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে। একথা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে যাকে কংক্রিট বলে আমরা জানি বা বুঝি তা প্রকৃতপক্ষে 'কংক্রিট' নয়। অর্থাৎ এ বিমূর্ততার গুণাগুণকে জীবনের সমস্ত বিষয় ও বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা মূলত সম্ভবই নয়। বরং এই জাগতিক জীবনের সমস্ত বিষয় ও বস্তুর সঙ্গে যখন অলৌকিকতা, বিমূর্ততা কিংবা অসীমের যোগ সৃষ্টি হয় তখনই তা সঠিক এবং তার সঠিক রূপ ও লাবণ্য কিংবা প্রাণের পূর্ণতা পেয়ে থাকে। এ বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, আচরণ, শিল্পকলা, সৃষ্টি, রীতিনীতি—এ সবকিছুই বিমূর্ততা ও অলৌকিকতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুক্ত এবং সার্থকভাবে প্রকাশমান। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে— কীভাবে তা জীবনযাত্রা ও সমাজকে প্রভাবিত করে।

আমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছি যে সংগীত, কবিতা, শিল্পকলা ইত্যাদির সঙ্গে বিমূর্ততা কী গভীরভাবে যুক্ত এবং সে সবকিছুর সার্থক রূপ মূলত এই বিমূর্ততার ওপরই গড়ে উঠেছে। এ বিষয়টিও খুব স্পষ্ট যে সমস্ত ব্যবহারিক বা মহাজাগতিক বস্তু কিংবা পদার্থগুলিও শেষ পর্যন্ত বিমূর্ততার পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন তা শুধুমাত্র রহস্যময় অণু-পরমাণুর খেলা। জীবন-মৃত্যু-অস্তিত্ব এইসব বিষয়গুলিও কত বিস্ময়কর এবং অলৌকিক।

এমনকি আমরা যখন ভাবি বা কোনো বিষয়ে চিন্তা করি তখনও কোনো সীমাহীন শূন্যতা থেকে, অলৌকিক এক বোধ থেকে— কোনো এক বিমূর্ত আলোর মধ্য থেকে যেন তার শুরু। এই প্রক্রিয়ার পিছনে যদিও শরীরগত কোনো চেতনা কাজ করছে

তবুও আমরা বুঝি এই সমস্ত বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি বিমূর্ত মনের কারসাজি। যে কোনো সৃষ্টিশীল ভাবনার পিছনেও তাই। এমনকি অঙ্কের মতো প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর সূত্র ও মনের এমন কোনো এক অ্যাবস্ট্রাক্ট স্তর বা চেতনা থেকে উঠে আসে। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো তার শুরুর, কখন কীভাবে ঘটে যায় তা যেন ব্যাখ্যা করে বলা যায় না।

বিমূর্ত চেতনা ও অনুভবের এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্য আমরা বার বার বুঝতে ভুল করি। মহাভারতের সেই গল্পটি মনে পড়ে। পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসকালে বকাসুর যখন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সব থেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার কী, তখন যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যে মানুষ এত মৃত্যু দেখছে প্রতিনিয়ত, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝে উঠতে চায় না যে সেও একদিন বা যে কোনো দিন মরে যেতে পারে। এ ঘটনাটির মধ্য দিয়ে মৃত্যু বিষয়ে যতখানি বলা হয়েছে তার থেকেও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আমাদের বোধের অভাবের কথা। আমরা প্রতিনিয়ত ভুল বুঝি। বাস্তব সম্পর্কে এবং বাস্তবের সঙ্গে এই বিমূর্ত চেতনা ও অলৌকিকতার যোগাযোগের বিষয়টি যে কত ব্যাপক এবং সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনও অসম্পূর্ণ বলেই আমাদের সমাজনীতি, রাজনীতি ও জীবনযাপন বিষয়ে এত অস্পষ্টতা। আমরা জীবনে, সমাজে, সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বাকছু বাস্তবিকভাবে, কংক্রিটভাবে পেতে চাই। পশ্চিমী এবং ইয়োরোপীয় চিন্তাধারায় কিংবা মার্ক্সীয় চিন্তা-ভাবনা প্রায় সে রকমই। বিমূর্ত চেতনাকে তথাকথিত প্রগতিশীল মার্ক্সবাদীরা কখনোই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি এবং এখনও করেন না। তাদের ধারণা ভাববাদী বিষয়-ভাবনা সবই জীবনের পরিপন্থী। তা অবাস্তব। বিমূর্ত চেতনাও তাই। তারা জীবনকে পরিমাপের মধ্য দিয়ে বাস্তবিকভাবে পেতে চেয়েছেন। তারা মনে করেন ভাববাদী চিন্তা-ভাবনা মানুষকে যুক্তিবাদী ভাবনা থেকে বিচ্যুত করে, অস্পষ্ট করে তোলে, বিভ্রান্ত করে সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে। বিমূর্ততা সেখানে অত্যন্ত অবহেলিত।

"Our policy in art, a policy of rejection of *abstractionism*, formalism and any other bourgeois distortions— is a Leninist policy which we have been unswervingly pursuing and will continue to pursue in the future" (Nikita Khrushchov, 8 March 1963).

তাঁরা বুঝতে পারেননি যে বিমূর্ত চেতনা, বিমূর্ততা বা ভাববাদী বিষয়গুলি— শুধুমাত্র বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বিষয় নয়— তা আরও গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি ব্যাপার। বাহ্যত মানুষ ও সমাজের কথা ভাবতে চাইলেও, তারা জাগতিক এবং মানবিক বিষয় সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়কে সত্যিই অবহেলা করেছেন— ভুল বুঝেছেন। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে বিমূর্ত চেতনা, বিমূর্ততা কিংবা ভাববাদ জীবনের সঙ্গে, প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে বিমূর্ততাকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনকে কল্পনা করা সম্ভব নয়। মার্ক্সবাদীরা তাঁদের

জীবনের রূপ ও রীতিনীতির মধ্যে বাস্তবিক হওয়ার 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতির মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতে সত্যিই অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

এইরকম একটি অসম্পূর্ণ চিন্তা নিয়ে যথার্থভাবে কোনো শিল্প-সংগীত-সাহিত্য চর্চা কিংবা সৃষ্টিশীলতা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কোনো সঠিক ভাবনা। সম্ভব নয় জীবনকে, সমাজকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা। ঐতিহাসিকভাবে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট জমানায় প্রচুর দক্ষতার সঙ্গে বড় বড় আকৃতির ছবি, ভাস্কর্যের কাজ হয়েছে কিন্তু মহৎ শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়নি প্রায় কিছুই। একথা একই সঙ্গে ধারণা করে নিতে পারি যে বিমূর্ততা, বিমূর্ত চেতনা, অলৌকিকতা বা ভাববাদকে সমাজজীবনের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তাঁরা সমাজ গঠনের একটি প্রয়োজনীয় এবং মৌলিক সূত্রকে অবহেলা করেছেন। ফলে রেজিমেন্টেশন প্রশ্রয় পেয়েছে। সব কিছুকে নিয়মকানুনের কঠিন বেড়াজালে শক্ত হাতে বেঁধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করে একটি 'মানবিক' সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যা অনড় মনোলিথিক স্ট্রাকচারের মতো 'কংক্রিট'— যেখানে স্থান পায়নি জীবনের, সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিময়তা, মানবিক অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত বিমূর্ত ভাব-ভাবনা, রূপ-অরূপ কিংবা অলৌকিকতার অবিশ্বাসযোগ্য ভূমিকা— যাকে বাদ দিয়ে কোনো রূপ, ভাবনা, গড়ন কিছুই সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। সে কারণেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত মার্ক্সবাদী সমাজব্যবস্থা হঠাৎ ভেঙে পড়ে। বাস্তবের সঠিক রূপ বিষয়ে তাদের ধারণার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। উন্নত আধুনিক কোনো সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে, সঠিক রাস্তা খুঁজে পেতে গেলে বিমূর্ত চেতনার ভূমিকাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। পশ্চিমী সভ্যতার তথাকথিত যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-প্রেমিক বাস্তববাদী-দেরও সেকথা মনে রাখতে হবে। কারণ মূর্তকে সম্পূর্ণ করতে গেলে বিমূর্ততার ছোঁওয়া, বিমূর্ত চেতনার যোগ তাতে চাই। লৌকিকের মধ্যে অলৌকিকের যোগ হওয়া চাই। রূপ সম্পূর্ণ হয় অরূপের স্পর্শে। সমস্ত বাস্তবিক বিষয়গুলি সব সময়েই অলৌকিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে— যথার্থ বাস্তবতা সেভাবেই গড়ে ওঠে।

রূপ যা কিছু দেখছি তার মধ্যে অরূপের যোগ থাকে বলেই রূপের এত বাহার। ইনফিনিটনেস কিংবা ইটারনিটির যোগ হয় সবকিছুর সঙ্গে তখনই তা প্রাণ পেয়ে ওঠে। এক অতীন্দ্রিয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত সেই বিমূর্ত চেতনা— যা সবকিছুর সারাৎসার তার যোগাযোগেই সমস্ত বাস্তবিক বিষয়গুলি প্রাণ পেয়ে ওঠে। তখনই তার আত্মা গড়ে ওঠে। ছবিতে গানে, কবিতায়— সমস্ত শিল্পে, জীবনেও, সমাজব্যবস্থাতেও। রূপের সঙ্গে অরূপ মিলেমিশে থাকে, বাস্তবের সঙ্গে অলৌকিক জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে, মূর্তর সঙ্গে অমূর্ত একাকার থাকে— এই চেতনা ছাড়া বাস্তবকে বোঝা যায় না। তাই বাস্তবিকভাবে কিছু ভাবতে গেলে, বাস্তবিকভাবে কিছু করতে গেলে বা গড়তে গেলে সেই চেতনা থাকা প্রয়োজন। এমনকি এও সত্যি যে ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা

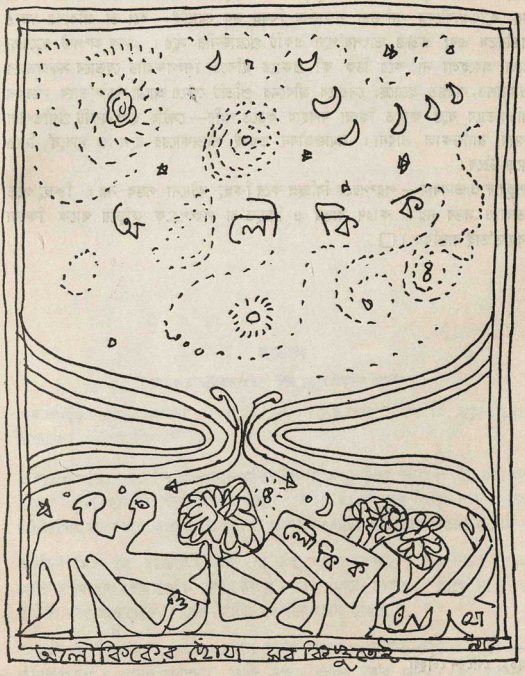
অলৌকিকের ছোঁয়া
লৌকিক

সামাজিক ভাবে সমস্ত দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্রেও এই বোধ অত্যন্ত সঠিক সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে। আপাত 'বাস্তবতা'কে অতিক্রম করে তখন আমরা পূর্ণতর বাস্তবতাকে ধারণা করতে পারি। শিল্পসৃষ্টি থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবন, সংসার কিংবা সমাজ, তার কাঠামো— রাজনীতি, সমাজনীতি— ইত্যাদি যা কিছু ইহজগতে আমাদের প্রয়োজন সে সবকিছু গড়তে গেলে এই বোধ ও ভাবনাই আমাদের সঠিক রাস্তায় নিয়ে যাবে। যেমন আমরা দেখেছি চিত্রকলায় এর যোগাযোগ— জীবনেও তাই। তাই বিমূর্ততার বিষয়টি শুধুমাত্র স্পিরিচুয়ালিজম নয়; ধর্মীয় একটি বিষয় নয়, বুদ্ধিজীবীদের পাণ্ডিত্য প্রকাশের বিষয় নয় মোটেই— বরং তা জীবনের ক্ষেত্রে গভীরতম এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রয়োজনীয় সূত্র। একে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য বলে অবহেলা না করে ঠিক কী প্রকারে ছবিতে, শিল্পকলায় যেভাবে সফলভাবে প্রকাশিত, ব্যবহৃত হয়েছে, সেভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আরো সতর্কভাবে, সজ্ঞানে সঠিকভাবে যুক্ত করতে কিংবা ব্যবহার করতে পারি— সেটাই হবে একটি প্রগতিশীল কিংবা র‍্যাডিকাল ভাবনা। সমাজজীবন তখনই সত্যিকারের রূপ ও মাধুর্য নিয়ে গড়ে উঠবে।

বস্তুবাদ ও ভাববাদ— পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে কিছু ঘটানো সম্ভব নয়। কিছু গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। কারণ বাস্তব ও বিমূর্ততা পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে কিংবা বিমূর্ততাই বাস্তবিক। □

স্কেচ: যোগেন চৌধুরী